বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৩৭ বার্ষিক সংখ্যা ১৪২৬

বাংলাদেশে তামাক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণঃ একটি পর্যালোচনা

মারুফ আহমেদ*

১। ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী অকাল মৃত্যু এবং রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হলো তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার। "তামাক সম্পর্কিত রোগের কারণে বিশ্বব্যাপী প্রতিবছর প্রায় ৫৪ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাপী তামাক সম্পর্কিত রোগের কারণে বার্ষিক মৃত্যু সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় ৮০ লাখে পৌঁছুবে। যদি তামাকপণ্য ব্যবহারে কোনো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ না করা হয় তাহলে এই শতাব্দীতে শুধুমাত্র তামাকজনিত রোগে প্রায় ১০ কোটি লোক মারা যাবে এবং এই মৃত্যুর প্রায় ৭৫ শতাংশেরও বেশি নিম্ন ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে সংঘটিত হবে" (Mathers and Loncar 2006)।

তামাক পণ্যের ব্যবহার প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর সর্বপ্রধান কারণ যার মধ্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, স্ট্রোক, দীর্ঘকালীন শ্বাসনালীর রোগ এবং অন্যান্য অ-সংক্রামক রোগ অন্তর্ভুক্ত। একই সাথে আশার বিষয় এই যে, এসব রোগের প্রাদুর্ভাবের হার নিশ্চিতরূপে কমিয়ে আনার কর্মপন্থা বর্তমানে সহজলভ্য কিন্তু এসব কর্মপন্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারের সদিচ্ছা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি। যদি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রণীত MPOWER নীতিমালায় বর্ণিত কৌশলসমূহ (তামাক পণ্য ব্যবহার ও প্রতিরোধ নীতিমালা পর্যবেক্ষণ করা; ধোঁয়াজাত তামাক পণ্য হতে জনসাধারণকে রক্ষা করা; তামাক পণ্য ব্যবহার ত্যাগে সাহায্য করা; তামাকের ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করা; তামাকের বিজ্ঞাপন ও প্রচার নিষিদ্ধ করা; তামাক পণ্যের উপর কর বৃদ্ধি করা) বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয় তবেই তামাকজনিত মৃত্যুহার বিশ্বব্যাপী কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম তামাক উৎপাদনকারী ও ভোগকারী দেশ। ২০১৭ সালের GATS প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৯২ লাখ লোক কমপক্ষে যেকোনো একটি তামাক পণ্য ব্যবহার করে থাকে। উদ্বেগের বিষয় হলো ২০০৯ হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত শুধু সিগারেট ধূমপায়ীর সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৫০ লাখে উন্নীত হয়। তাই এ প্রবন্ধে বিদ্যমান সিগারেট কর ব্যবস্থা ও সিগারেটের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উপায়সমূহ সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তামাক ব্যবহারকারী এ বিপুল জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্যঝুঁকির দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার Global Disease Burden প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র তামাক পণ্য ব্যবহারের কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। তামাক পণ্যের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ তাই সময়ের দাবি। অন্যথায় শুধুমাত্র তামাকসৃষ্ট স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের কারণেই বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট স্বাস্থ্য নির্দেশক অর্জনে ব্যর্থ হবে। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিপর্যয় নয় বরং তামাক চাষ ও যত্রতত্র তামাক পণ্য ব্যবহারের কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয়ও সমভাবে

*গবেষণা সহযোগী, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

উল্লেখযোগ্য। তাই এই গবেষণা প্রবন্ধে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রমের বর্ণনা ও তার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন মানবসম্পদ উন্নয়নের আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। কেননা এ আন্দোলন তামাকজনিত রোগের কারণে সংঘটিত অকাল মৃত্যুজনিত ক্ষতি, শারীরিক অক্ষমতাজনিত ক্ষতি এবং এ রোগসমূহের চিকিৎসা বাবদ খরচের ক্ষতিসমূহই হ্রাস করতে সচেষ্ট হয় না, বরং সুস্থ জীবন প্রদানের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী তামাকের কারণে উদ্ভূত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় সারা বিশ্বের মোট জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ (Tobacco Atlas 2018)। যদি এই বিপুল সম্পদের অপচয় বন্ধ করে তা উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় বিনিয়োগ করা হতো তবে নিঃসন্দেহে তা মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো।

২। গবেষণার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু

বিশ্বব্যাপী মানবসৃষ্ট এ তামাক দুর্যোগের করাল থাবার প্রেক্ষিতে বর্তমানে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারের অবস্থা, তামাকের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও তার কার্যকারিতা মূল্যায়ন, এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে তথ্য ও উপাত্ত ভিত্তিক নির্দেশনা অত্যন্ত জরুরি। এ লক্ষ্যে এই গবেষণা প্রবন্ধে গত ১০ বছরে (২০০৯-২০১৮) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিরীখে বিভিন্ন তামাক পণ্যের উপর সরকার আরোপিত বিভিন্ন হারের তামাক কর কিভাবে স্ব স্ব ও সংশ্লিষ্ট পণ্যের দামের উপর প্রতিফলিত হয় তা নিয়ে আলোচনা করা হবে। তামাক পণ্যের দামের এ পরিবর্তন কিভাবে তামাকপণ্য ব্যবহারকারীদের (প্রাপ্ত বয়স্ক, ১৫+বছর বয়সী) সংখ্যাগত ও ভোগের মাত্রাগত পরিবর্তন ঘটায় তার উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে রচিত তামাক-সংক্রান্ত বিদ্যমান গবেষণাপত্রগুলোর মধ্যে এ গবেষণা প্রবন্ধের মৌলিক অবদান হলো সর্বশেষ ১২ বছরের সময় ভিত্তিক বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের ক্রয় ক্ষমতার পরিমাপের সূচক তথা আপেক্ষিক আয় দাম নির্ধারণ (Blecher & Walbeek 2004 পদ্ধতি অনুযায়ী)।

এছাড়া এ গবেষণা প্রবন্ধে আলোচ্য সময়ে কিভাবে বাংলাদেশে তামাক চাষকৃত এলাকার পরিমাণ ও তামাক পণ্যের উৎপাদন পরিবর্তিত হয়েছে তার উপরও আলোকপাত করা হবে। তামাক চাষ কিভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হবে। এ লক্ষ্যে তামাক চাষের পরিবেশগত কুফল ও দারিদ্র্যতার শৃঙ্খল সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

৩। তথ্য ও উপাত্ত

এই প্রতিবেদনে তথ্যের মাধ্যমিক উৎস হিসেবে WHO (2006), GATS (2009), GYTS (2013), GATS (2017) ইত্যাদি জরিপের প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো সারা বাংলাদেশব্যাপী পরিচালিত এবং জাতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল জরিপ। এ প্রবন্ধে তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসেবে PROACTT (2018) মাঠ জরিপের উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। PROACTT (2018) জরিপটি ২০১৮ সালে বহুস্তরভিত্তিক গুচ্ছ নমুনায়নের ভিত্তিতে পরিচালিত। প্রথম পর্যায়ে সারা বাংলাদেশব্যাপী মোট ১০,০০০ খানার উপর পরিচালিত এই জরিপের ২,৬০০ পরিবারে কমপক্ষে

একজন তামাক দ্রব্য ব্যবহারকারী পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৯৯৮ জন তামাক দ্রব্য ব্যবহারকারীর তামাকজনিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রমাণিত চিকিৎসাপত্র থাকায় দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের চিকিৎসা সম্পর্কিত বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। প্রথম পর্যায়ে এ জরিপে অংশগ্রহণকারী ১০,০০০ খানার মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৫,৮৯০ জন। এছাড়াও IHME, BBS, FAOSTAT, DAE এর ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত প্রাসঙ্গিক তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ গবেষণা প্রবন্ধে।

৪। বাংলাদেশে তামাক দ্রব্যের উপর আরোপিত বিদ্যমান কর ব্যবস্থা

বর্তমানে সারাবিশ্বে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক প্রণীত FCTC তে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা ১৮১টি এবং তা ইতিমধ্যে একটি সুস্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয়ের এক আদর্শ ও উপযোগী কর্মপন্থা রূপে মর্যাদা পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী ধূমপান বিরোধী রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ও সংহতি প্রকাশ (FCTC চুক্তি অনুযায়ী), জনস্বাস্থ্যের উপর তামাক পণ্য ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি, এবং তামাকজাত পণ্যের উপর কর আরোপের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি- এই তিন লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকার ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ২০১৯-২০ সালের বাজেটে তামাক পণ্যের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে করারোপের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

কর আরোপের মাধ্যমে তামাক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি তামাক দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। সারা বিশ্বে সবচেয়ে কম দামে তামাক দ্রব্য পাওয়া যায় এমন দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে তামাক দ্রব্যের প্রকৃত দাম আরও কমেছে। বাংলাদেশে তামাক দ্রব্যের ধরন এবং ব্র্যাণ্ডের উপর ভিত্তি করে কর কাঠামোর তারতম্য হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে সিগারেটের শ্রেণিবিভাজন কাঠামো একটি স্তর ভিত্তিক কাঠামো (Tiered Structure) যা সিগারেটের খুচরা মূল্যের উপর ভিত্তিশীল এবং বিভিন্ন স্তরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভিন্ন ভিন্ন মূল্য অনুযায়ী (Ad-valorem) কর আরোপ করা হয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে বিড়ির ওপর করারোপের ভিত্তিমূল্য শুল্ক মূল্য হতে বাজারের খুচরা মূল্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ধোয়াবিহীন তামাক দ্রব্যের কর ভিত্তি (tax base) খুচরা মূল্যে স্থানান্তর করায়, কর ভিত্তি বর্তমানে অপেক্ষাকৃত বেশি দামের ওপর আরোপিত হয়েছে, ফলে তামাক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ঘটেছে যা এর ভোক্তা সংখ্যা হ্রাসে সহায়ক সিদ্ধ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সরকারের আহরিত কর বৃদ্ধি পায় যা দিয়ে সরকার অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি ঘটাতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের সকল প্রকার তামাক দ্রব্যের উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। তথাপি বর্তমানে বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত তামাক পণ্যগুলোর খুচরা মূল্যের ওপর আরোপিত সর্বমোট শুল্ক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত (খুচরা মূল্যের ৭৫ শতাংশ) শুল্ক হতে অনেক কম।

জটিল মূল্যানুপাতিক (ad-valorem) করকাঠামো, বিভিন্ন আকৃতির প্যাকেটে বিভিন্ন ধরনের তামাক দ্রব্যের বিচিত্রতা, তামাক খাত হতে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং কর্মসংস্থানের অতিরঞ্জন বাংলাদেশ তামাক দ্রব্যের উপর অতি নিম্নমাত্রায় কর আরোপের কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তামাক পণ্যের উপর একটি কার্যকর কর কাঠামো এবং সর্বাপেক্ষা কাম্য কর হার নির্ধারণে বিভিন্ন ধরনের তামাক পণ্যের চাহিদা ও যোগানের গতি প্রকৃতি, মূল্যস্ফীতি ও আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে তামাক পণ্যের দাম বৃদ্ধি, তামাক

পণ্যের ভোক্তা সংখ্যা ও ভোগকৃত পরিমাণের উপর বিভিন্ন ধরনের কর অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনা অপরিহার্য। এ ছাড়াও তামাকপণ্যের উপর কর বৃদ্ধির মাধ্যমে পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রক্রিয়া এ খাত হতে আহরিত রাজস্বের পরিমাণে ও এ খাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে সে সম্পর্কে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি।

প্রচলিত তামাক পণ্যসমূহকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্য যেমন বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা ইত্যাদি (২) ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য যেমন জর্দা, গুল, সাদাপাতা, নস্যি ইত্যাদি। নিম্নে উভয় প্রকার তামাক পণ্যের উপর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আরোপিত কর ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৪.১। ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের উপর কর

বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চারটি দাম স্তরের উপর ভিত্তি করে-নিম্ন দাম, মাঝারি দাম, উচ্চ দাম, প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ড-সিগারেটের উপর চার স্তর ভিত্তিক আবগারি শুল্ক আরোপ করে। প্রতিটি স্তরের কর, সেই স্তরের দামের আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হয়। ফলে প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ড ও উচ্চ দামের সিগারেটের কর হারের তুলনায় নিম্ন দামের সিগারেটে কম হারে কর আরোপিত হয়। বাংলাদেশে ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত পণ্যের উপর আরোপিত কর হার ও তার তুলনামূলক চিত্র সারণি ১-এ উপস্থাপন করা হলো :

সারণি ১: বাংলাদেশে ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত পণ্যের উপর আরোপিত করহার

ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত দ্রব্য	পরিমাণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০	শলাকা প্রতি মূল্যবৃদ্ধি	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০	২০১৯-২০	২০১৯-২০
সিগারেট (দাম স্তরের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস)		মূল্য (টাকা)	মূল্য (টাকা)	পরিবর্তন (শতাংশ)		সম্পূরক শুল্ক (শতাংশ)	সম্পূরক শুল্ক (শতাংশ)	পরিবর্তন (শতাংশ)	মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) (শতাংশ)	স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ (শতাংশ)
নিম্ন স্তর	১০ শলাকার	৩৫	৩৭	৫.৭	২০ পয়সা	৫৫	৫৫	০	১৫	১
মধ্যম স্তর	১০ শলাকার	৪৮	৬৩	৩১.৩	১.৫ টাকা	৬৫	৬৫	০	১৫	১
উচ্চ স্তর	১০ শলাকার	৭৫	৯৩	২৪	১.৮ টাকা	৬৫	৬৫	০	১৫	১
উচ্চ স্তর-প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ড বিড়ি	১০ শলাকার	১০৫	১২৩	১৭.১	২.৩ টাকা	৬৫	৬৫	০	১৫	১
যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া হাতে তৈরি ফিল্টারবিহীন বিড়ি	২৫ শলাকা	১২.৫	১৪	১২	০.০৬ পয়সা	৩০	৩৫	৫	১৫	১
ফিল্টার যুক্ত বিড়ির শলাকা	২৫ শলাকা	১৫	১৭	১৩.৩	০.০৮ পয়সা	৩৫	৪০	৫	১৫	১

সারণি ১ হতে লক্ষণীয় যে, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে নিম্নস্তরের সিগারেটের দাম পূর্বের বছরের তুলনায় শলাকা প্রতি মাত্র ২০ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। যেখানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১১.৩২ শতাংশ সেখানে নিম্নস্তরের সিগারেটের মাত্র ৫.৭ শতাংশ দাম বৃদ্ধি সিগারেটের ব্যবহার কমাতে স্পষ্টরূপে অকার্যকর বলেই প্রতীয়মান হয়। নিম্ন স্তরের সিগারেটের দামের প্রতি এতো জোর আরোপের অন্যতম কারণ হলো সমস্ত সিগারেট ব্যবহারকারীদের প্রায় ৭৯ শতাংশ নিম্ন দামস্তরের অন্তর্ভুক্ত সিগারেট ধূমপায়ী। যেহেতু এ নিম্ন দাম স্তরের সিগারেটের ভোগ অনেক বিস্তৃত এবং তা সিগারেট হতে আহরিত রাজস্বের সর্বোচ্চ যোগান দাতা, তাই স্বাভাবিকভাবেই এই স্তরের সিগারেটের উপর নিম্ন হারে আরোপিত কর মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। কারণ এই স্তরের উপর অতি উচ্চমাত্রায় বর্ধিত কর মানে একদিকে যেমন এর ভোক্তা সংখ্যা ও ভোগের পরিমাণ হ্রাস করবে, অন্যদিকে তা রাজস্ব বাড়াতে সহায়ক হবে। এই স্তরের সিগারেটের ক্ষেত্রেও সম্পূরক শুল্ক পূর্বের বছরগুলোর ন্যায় ৫৫ শতাংশে স্থির রাখা হয়েছে। তাই নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম ও শুল্ক বৃদ্ধি ব্যতীত তামাক পণ্য ব্যবহার হ্রাসের উদ্দেশ্য কখনো বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে এ বাজেটে মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম দামস্তরের সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক ৬৫% এ স্থির রাখা হয়েছে এবং প্রতি ১০ শলাকার দাম যথাক্রমে ৬৩, ৯৩ ও ১২৩ টাকা ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি শলাকা সিগারেটের সর্বোচ্চ মূল্য দাঁড়াচ্ছে ১২ টাকা ৩০ পয়সা এবং সর্বনিম্ন ৩ টাকা ৭০ পয়সা।

অন্যদিকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রতি শলাকা বিড়ির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৬ পয়সা যা বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক সঙ্গতির তুলনায় নিতান্তই সামান্য (সারণি ১)। সরকার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব এবং গণস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিবেচনায় যদিও বিড়ি শিল্প বন্ধ করার ব্যাপারে বার বার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও বাস্তবে এ বাজেটে তার কোনো প্রতিফলন পাওয়া যায়নি। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ২৫ শলাকার নন-ফিল্টারড বিড়ির দাম মাত্র ১.৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ বিড়ি প্রতি মাত্র ৬ পয়সা দাম বেড়েছে। মন্দের ভাল বলতে গেলে, সরকার পরপর তিন বছর সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশে স্থির রাখার পর এই বাজেটে তা পূর্বের তুলনায় ৬.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও, সকল প্রকার তামাক পণ্যের উপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট ও ১ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ আরোপ করা হয়।

এ প্রবন্ধে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে দাম বৃদ্ধিকে তামাকপণ্যের ভোগের পরিমাণ হ্রাসের উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দাম স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে দাম ও ভোগের পরিমাণের সম্পর্ক সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করা হয়। যেহেতু বাংলাদেশে সিগারেট হতে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ, তাই এই প্রবন্ধে সিগারেটের আয় ও দাম স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। Ali *et al.* (2003) এর গবেষণাপত্রে সিগারেটের দাম স্থিতিস্থাপকতা-০.২৭ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ সিগারেটের দাম ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করলে, সিগারেট ভোগের মাত্রা প্রায় ৩ শতাংশ হ্রাস পাবে। অন্যদিকে Nargis *et al.* (2014) এর গবেষণাপত্রে সিগারেটের দাম স্থিতিস্থাপকতা দাঁড়ায়-০.৪৯। অর্থাৎ প্রতি ১০ শতাংশ সিগারেটের দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সিগারেট ভোগের পরিমাণ ৪.৯ শতাংশ হ্রাস পাবে। যদি দাম স্থিতিস্থাপকতার সময় ভিত্তিক তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যদি সিগারেটের দাম ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে সিগারেট ভোগের পরিমাণ অধিকহারে হ্রাস পাবে। তাছাড়া সমপরিমাণ দাম বৃদ্ধিতে যেখানে ধনীদের সিগারেট ভোগ মাত্রা মাত্র ৩.৬ শতাংশ হ্রাস পাবে, সেখানে নিম্ন আয়ের মানুষদের সিগারেট ভোগ মাত্রা ৭.৫ শতাংশ হারে হ্রাস পাবে। যেহেতু সিগারেটের

উপর আরোপিত কর সর্বশেষ খুচরা মূল্যের খুবই সামান্য অংশ, তাই সিগারেটের ১০ শতাংশ দাম বৃদ্ধির জন্য ১০ শতাংশের এর অধিক হারে কর আরোপ করতে হয়। অর্থাৎ কর বৃদ্ধির মাধ্যমে দাম বৃদ্ধির ফলে যেমন দরিদ্রদের সিগারেট ভোগের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব, তেমনি ধনীদের ভোগ হতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সিগারেটের উপর কর বৃদ্ধির মাধ্যমে একদিকে যেমন সিগারেট ভোগের পরিমাণ কমানো সম্ভব (নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর), তেমনি অন্যদিকে কর বৃদ্ধির ফলে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধিও সম্ভব (ধনীদের ভোগ হতে)। এছাড়াও এ গবেষণাপত্রে উল্লেখিত যে প্রতি ১০ শতাংশ খানার আয় বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে উচ্চ আয়ের মানুষের সিগারেট ভোগ যেখানে মাত্র ১.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায় সেখানে নিম্ন-আয়ের মানুষের সিগারেট ভোগ মাত্রা আরও অধিক হারে তথা ৩.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়।

বহুস্তর ভিত্তিক জটিল কর কাঠামো পদ্ধতি বাংলাদেশে সিগারেটের উপর উচ্চহারে কর আরোপের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি করে বিদ্যমান ভোক্তা সংখ্যা হ্রাস ও নতুন ভোক্তাদের সিগারেট গ্রহণে নিবৃত্ত করতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। শুধু সিগারেটই নয়, ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে বিড়ি ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমানোর কোনো কার্যকর উদ্যোগ দৃশ্যত পরিলক্ষিত হয়নি। সরকার প্রতিশ্রুত বিড়ি শিল্প সম্পূর্ণ বন্ধের কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনা বাজেটে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। উপরন্তু সরকার বিড়ি কারখানার মালিকদের চাপের মুখে নতি স্বীকার করে ২৫ টাকার নন ফিল্টার বিড়ির দাম গত তিন বছর যাবৎ ১২.৫০ টাকায়ই স্থির রেখেছে। শুধু তাই নয় বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার নামে সরকার স্থানীয় বিড়ি শিল্পের বিদ্যমান সব সুযোগ-সুবিধা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। যেহেতু বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নিকট এবং একই সাথে নিম্ন আয়ের মানুষের নিকট বিড়ি অত্যন্ত জনপ্রিয়, যেহেতু বিড়ির দাম স্থির রাখা প্রকারান্তরে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার শামিল।

সার্বিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, কিছু তামাক পণ্যের উপর কর না বাড়ানো এবং কিছু পণ্যের উপর নিতান্ত সামান্য দাম বৃদ্ধি, তামাক পণ্যের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অক্ষম। উপরন্তু মূল্যস্ফীতি ও ক্রমবর্ধমান মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বিবেচনায় তামাক পণ্যের এমন সহজলভ্য দাম ও প্রতি বছরে এমন যৎসামান্য দাম বৃদ্ধি একদিকে যেমন বিদ্যমান ব্যবহারকারীদের ভোগ কমাতে পারবে না, অন্যদিকে এ দাম সম্ভাব্য নতুন ব্যবহারকারীদের তামাক পণ্য ব্যবহার শুরু করা থেকে বিরত রাখতেও অকার্যকর হবে। এমতাবস্থায় তামাক পণ্য প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মুনাফা বৃদ্ধির সকল প্রয়াসই অব্যাহত রাখবে। যে পর্যন্ত সরকার তামাক পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোকে মুনাফা করার এমন সুবর্ণ সুযোগ দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অভিনব বাজারজাতকরণ কৌশলের মাধ্যমে তাদের বাজার সম্প্রসারণ করেই চলবে। এ বক্তব্যের স্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায় যখন জাপান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশের আকিজ টোব্যাকো কোম্পানিকে কিনে নেয় এবং বাংলাদেশে তাদের ব্যবসার সূত্রপাত ঘটায়। জাপান টোব্যাকো কোম্পানি তাদের ওয়েবসাইটে বাংলাদেশের তামাক দ্রব্যের বাজারে ব্যবসা সম্প্রসারণের কারণ হিসেবে ক্রমবর্ধমান ভোক্তা সংখ্যা বৃদ্ধি, তামাক ব্যবসা সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ এবং দুর্বল তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কথা উল্লেখ করে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, যখন জাপান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশি আকিজ টোব্যাকো কোম্পানিকে ১২,৪৩০ কোটি টাকার বিনিময়ে কিনে নেয়, তখন বাংলাদেশের মিডিয়াগুলো এ মৃত্যু-বাণিজ্যকে তাদের প্রতিবেদনে এ যাবৎকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিদেশী

প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হিসেবে উল্লেখ করে। এ অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে একদিকে যেমন বিদ্যমান ভোক্তারা তাদের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে নব্য ভোক্তারাও তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে।

বাজারের আকার বিবেচনায় বাংলাদেশে সিগারেটের বাজার সবচেয়ে বড়। তবে এই বাজারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এই বাজার মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার এবং এখানে বিক্রেতা ফার্মগুলো পণ্যের ব্র্যাণ্ড ও আকৃতির ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ করে থাকে। সারণি-২ হতে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের প্রধান চারটি তামাক প্রস্তুতকারক কোম্পানি নিম্নস্তরের সিগারেট প্রস্তুত ও বিপণন করে থাকে। কারণ সিগারেটের মধ্যে নিম্ন দামের সিগারেটের ভোক্তা সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তাছাড়া ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো এবং ঢাকা টোব্যাকো শুধুমাত্র প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ড ও উচ্চ স্তরের সিগারেট প্রস্তুত ও বিপণন করে থাকে। অন্যদিকে যদিও বিড়ির বাজার সিগারেটের তুলনায় ছোট, তারপরও বিড়ির বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

সারণি ২: বাংলাদেশের প্রধান তামাক কোম্পানিগুলোর বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের দাম ভিত্তিক অবস্থান

তামাক কোম্পানি	উচ্চ স্তর-প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ড	উচ্চ স্তর	মধ্যম স্তর	নিম্ন স্তর
ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি বাংলাদেশ	বেনসন এণ্ড হেজেস	জন প্লেয়ার গোল্ড লিফ, পাল মল এবং ক্যাপ্সটান	স্টার, সিজরস, স্টারলাইট	ব্রিস্টল, পাইলট এবং হলিউড
ঢাকা টোব্যাকো	মালবোরো	ক্যাসল	নেভি	লিজেণ্ড হোয়াইট, সুরমা এণ্ড ডায়মণ্ড, রেড এণ্ড হোয়াইট, গোল্ড মাইন, শেখ, কে-টু
আবুল খায়ের টোব্যাকো	-	-	ম্যারিস	রালি এণ্ড সানমুন
নাসির টোব্যাকো ইণ্ড্রাস্ট্রিজ	-	-		নাসির গোল্ড, এশিয়া ও টপ টেন

৪.২। ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের উপর কর

সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ১০ গ্রাম জর্দা ও গুলের দাম যথাক্রমে ৩০ টাকা ও ১৫ টাকা নির্ধারণ করেছে এবং উভয়ের উপর ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করেছে (সারণি ৩)। এ বাজেটের উল্লেখযোগ্য দিক হলো ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের উপর পূর্বের বছরগুলোতে বিদ্যমান সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের কর ভিত্তির পরিবর্তে ওজন ভিত্তিক কর ভিত্তি প্রবর্তন। নিঃসন্দেহে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের ওজন-ভিত্তিক করারোপ একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ, যা একদিকে যেমন এর ব্যবহার কমাতে সাহায্য করবে তেমনি অন্যদিকে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। এ ছাড়া এই পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য ব্যবহারের প্রধান ভোক্তাগোষ্ঠী গ্রামীণ নারীদেরকে এর ক্ষতিকর দিক থেকে কিছুটা হলেও বাঁচাতে সক্ষম হবে। কেননা স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে পুরুষের চেয়ে নারীরা অনেক পিছিয়ে এবং যেহেতু ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য নারীরাই বেশি ব্যবহার করে যেহেতু ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি প্রকারান্তরে নারী স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রত্যয়েরই প্রতিফলন। এছাড়াও সরকার ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য হতে অধিক পরিমাণে করও আহরণ করতে পারবে। তবে সরকার গৃহীত এ প্রশংসনীয় পদক্ষেপের উচ্ছ্বাস প্রায় ম্লান হয়ে যায় যখন বিদেশ হতে আমদানিকৃত প্রক্রিয়াজাত তামাক দ্রব্যের উপর

থেকে সরকার ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করে নেয়। নিঃসন্দেহে এ পদক্ষেপগুলো সমস্টিগতভাবে বাংলাদেশে দেশি ও বিদেশি উভয় ধরনের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তাদের তামাকের ব্যবসা সম্প্রসারণে উৎসাহিত করবে এবং একই সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশের প্রত্যয় বাস্তবায়ন কঠিনতর করে তুলবে। যদি ২০১৯ সাল থেকেও শুরু করা হয়, তাহলে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে গেলে প্রতিবছর প্রায় ১৮ লাখ তামাক দ্রব্য ব্যবহারকারীকে তামাক দ্রব্যের ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত করতে হবে (Nargis *et al.* 2017)।

সারণি ৩: ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের উপর আরোপিত কর ব্যবস্থা

ধোয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য	পরিমাণ	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০১৮-১৯ থেকে ২০১৯-২০	২০১৯-২০	২০১৯-২০
		মূল্য (টাকা)	মূল্য (টাকা)	পরিবর্তন (শতাংশ)	সম্পূরক শুল্ক (শতাংশ)	সম্পূরক শুল্ক (শতাংশ)	পরিবর্তন (শতাংশ)	মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) (শতাংশ)	স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ (শতাংশ)
জর্দা	১০ গ্রাম	সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ৫০ টাকা (প্রতি ২০ গ্রাম)	৩০*	-	৪৫	৫০	৫	১৫	১
গুল	১০ গ্রাম		১৫*	-	৪৫	৫০	৫	১৫	১

টীকা: * সর্বোচ্চ খুচরা মূল্যের পরিবর্তে ওজন ভিত্তিক কর ভিত্তি প্রবর্তন।

এ বাজেটে তামাক পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপরে ৪৫ শতাংশ করপোরেট ট্যাক্স এবং ২.৫ শতাংশ স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ অব্যাহত রাখা হয়েছে (সারণি ৩)। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কোনো বাস্তব প্রতিফলন এ বাজেটে ঘটেনি এবং তা তামাক বিরোধী আন্দোলনের গতিও স্লথ করে দেয়।

সবচেয়ে আশঙ্কার দিক হলো এ বাজেটে প্রক্রিয়াজাতকৃত তামাক পণ্যের উপর প্রচলিত "শূণ্য" শতাংশ রপ্তানি শুল্ক অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং অ-প্রক্রিয়াজাতকৃত তামাক পণ্যের উপর রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ পদক্ষেপ তামাক বিরোধী আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করে কারণ এতে দেশের অভ্যন্তরে তামাক চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয় যা পরিনামে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। এজন্য পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে তামাক চাষের গতি-প্রকৃতি ও চাষকৃত জমির পরিমাণ, উৎপাদনের পরিমাণের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৫। বাংলাদেশে তামাক চাষ: পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া

তামাক পণ্য ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতিসমূহকে মোটাদাগে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) তামাক ও তামাকজাত পণ্য সামগ্রী ভোগের ফলে সৃষ্ট খরচসমূহ এবং (২) তামাকজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিসমূহ। নিম্নে বাংলাদেশে তামাক চাষের গতিধারা ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

বাংলাদেশ তামাক চাষকৃত এলাকা আয়তনের দিক থেকে বিশ্বে ১৪তম, তামাক উৎপাদনের পরিমাণের দিক হতে ১২তম এবং বৈশ্বিক তামাক উৎপাদনের প্রায় ১.৩ শতাংশের যোগানদাতা (FAOSTAT, 2019)। তামাক চাষ সাধারণত উর্বর জমি এবং নদী নিকটবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকে। তামাক চাষের জন্য উর্বর জমি, প্রচুর জ্বালানি কাঠের সরবরাহ এবং পর্যাপ্ত পানির প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে তামাক চাষকৃত এলাকাগুলোতেও এই তিনের প্রতুলতা ছিল বলেই সেখানে তা কেন্দ্রীভূত হয় এবং সময়ের ব্যবধানে যখন কোনো একটি উপাদান নিঃশেষ হয় তখন অন্য এলাকায় তামাক চাষ স্থানান্তরিত হয়।

বাংলাদেশের সর্বপ্রথম তামাক চাষ ১৯৭০ এর দশকে তিস্তা নদীর পলল সমৃদ্ধ উর্বর ভূমি অঞ্চল রংপুর জেলাতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির হাত ধরে শুরু হয়। তামাক চাষের কারণে ভূমির উর্বরতা রংপুর অঞ্চলে খুব দ্রুত হ্রাস পেলে তামাক চাষ গাঙ্গেয় প্লাবনভূমির উর্বর অঞ্চল কুষ্টিয়া জেলায় স্থানান্তরিত হয়। যদিও কুষ্টিয়া এখনও বাংলাদেশের সর্বোচ্চ তামাক উৎপাদনকারী জেলা তবে ২০০০ সালের পর থেকে যখন কুষ্টিয়া অঞ্চলের জ্বালানি কাঠ সরবরাহে অপ্রতুলতা দেখা দেয় তখন তামাক চাষ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক বন থেকে জ্বালানি সংগ্রহের সহজলভ্যতা এবং উর্বর জমির কথা বিবেচনায় রেখে মাতামুহুরী নদী নিকটবর্তী অঞ্চলে পুরোদমে শুরু হয়।

চিত্র ১: সময় পরম্পরার ভিত্তিতে বাংলাদেশে তামাক চাষকৃত এলাকা, উৎপাদন ও একর প্রতি ফলন

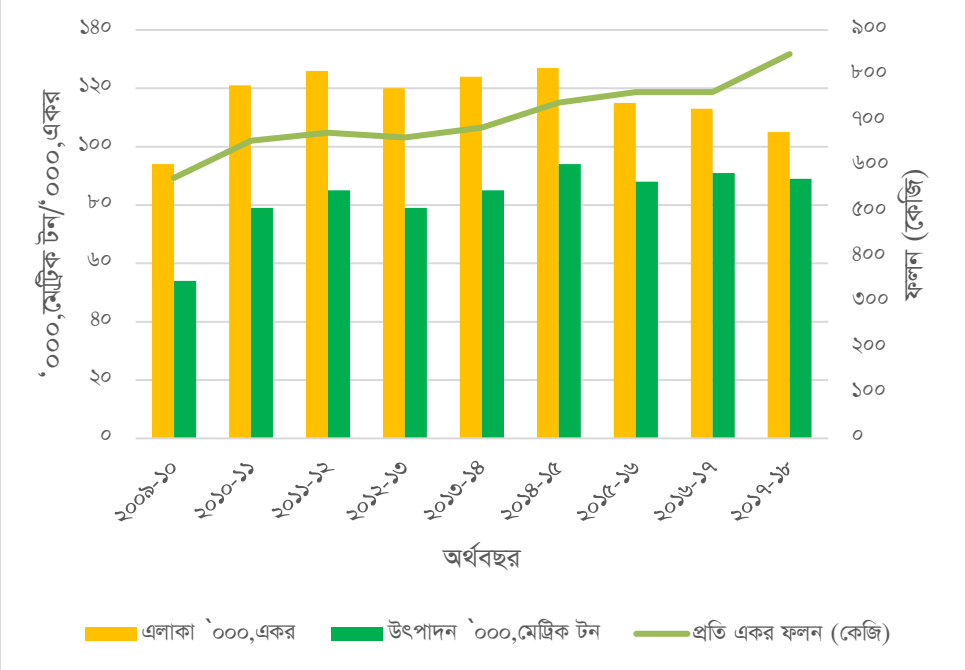

তথ্যসূত্র: *Statistical Year Book* ও *Bangladesh Economic Review* (বিভিন্ন বছর)।

বাংলাদেশে গত ১০ বছরের তামাক চাষের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তামাক চাষকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে প্রতি বছর চাষযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে (চিত্র ১)। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দেশে ৯৪,৫৬৮ একর জমিতে তামাক চাষ হয়েছিল এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা আরো ১০,৬৯৫ একর বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ১০৫,২৬৩ একরে দাঁড়ায়। লক্ষণীয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে তামাক চাষকৃত জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১২৭,৩৭৯ একরে দাঁড়ায়। যখন তামাক চাষকৃত জমির পরিমাণ বাড়বাড়ন্ত তখনই ২০০০ হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চাষযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ প্রতিবছর গড়ে ৬৮,৬৯০ হেক্টর করে হ্রাস পায় (SRDI তথ্যভাণ্ডার)। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই অবস্থা চলতে থাকলে শুধুমাত্র তামাক চাষের কারণে বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন হবে। ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত এই ৯ বছরে তামাক দ্রব্যের উৎপাদন ৬১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৫২৮ মেট্রিক টন হতে ৮,৯২৪ মেট্রিক টনে উন্নীত হয় (চিত্র ১)। যদিও উল্লেখিত সময়ে মোট উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু জেলাওয়ারী তথ্য হতে আরও চমকপ্রদ তথ্য মিলে কেননা আলোচ্য সময়ে নতুন কিছু জেলায় তামাক চাষকৃত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়, আবার আগে থেকে তামাক চাষ হয়ে আসছে এমন জেলাগুলোতে চাষকৃত জমি ও উৎপাদন উভয়ই হ্রাস পায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের মোট তামাক চাষকৃত জমির প্রায় ৩৩.৭ শতাংশ কুষ্টিয়ায়, ১৬.৮ শতাংশ লালমনিরহাটে ও ১০.৭ শতাংশ নীলফামারীতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মেহেরপুর, রংপুর ও মানিকগঞ্জেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জমিতে তামাকের চাষ হয়। এই ৬টি জেলাতেই ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সারাদেশে তামাক চাষকৃত জমির প্রায় ৮৩ শতাংশ ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ২: সময় পরম্পরার ভিত্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তামাক চাষকৃত জমির পরিমাণ (একর)

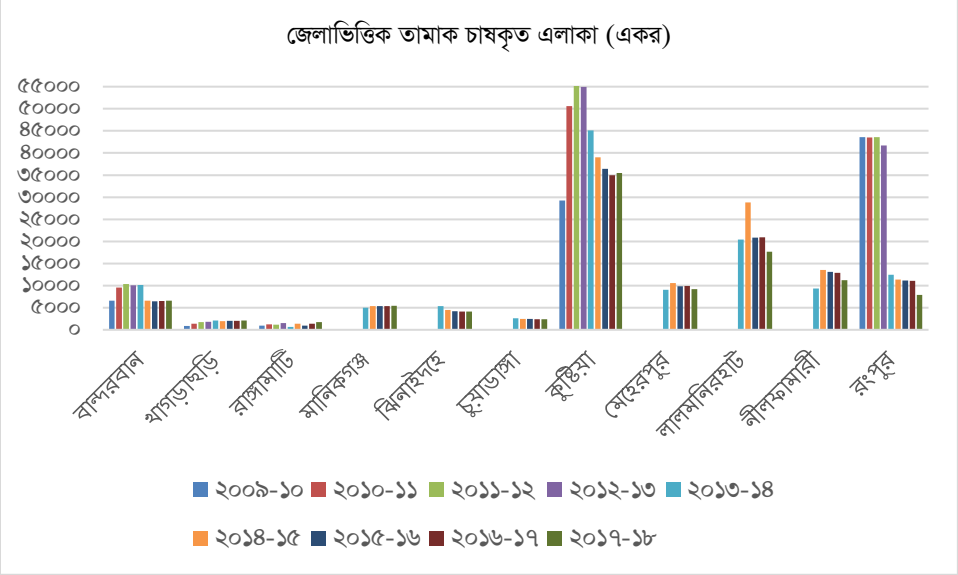

তথ্যসূত্রঃ *Statistical Year Book* (বিভিন্ন বছর)।

চিত্র ২ থেকে দেখা যায় যে, তামাক চাষের জন্য চিরায়িতভাবে পরিচিত জেলাসমূহ (কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, নীলফামারী ইত্যাদি) হতে তামাক চাষ পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাসমূহে স্থানান্তরিত হচ্ছে। এর কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তামাক চাষের জন্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। একই জমিতে বারবার অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করায় স্বভাবতই জমির উর্বরতা শক্তি হারিয়ে যায়। তাই তামাক চাষ সবসময়ই এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। যদিও কুষ্টিয়া অঞ্চল এখনও বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ তামাক চাষএলাকা, তারপরও গত ৪ বছরে এ জেলায় তামাক চাষের জমির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। যখন কুষ্টিয়াতে জ্বালানি কাঠের সহজলভ্যতা ফুরিয়ে যায়, তখন বান্দরবন ও কক্সবাজার জেলার লাইফ লাইন বলে খ্যাত মাতামুহুরী নদীর তীরে নিবিড়ভাবে তামাক চাষ শুরু হয়। যদিও ১৯৮০'র দশকেই মাতামুহুরী নদীকেন্দ্রিক তামাক চাষ শুরু হয়েছিছল তবে তা নিতান্তই সামান্য ছিল। যে বান্দরবনে এক সময় নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হতো, তামাক চাষ শুরুর পর তা বর্তমানে খাদ্য ঘাটতির জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে মাতামুহুরী নদী তীরবর্তী ৮০ কিলোমিটার অঞ্চলে তামাক চাষ হয়। FCTC র ১৮ নং অনুচ্ছেদে পরিবেশ রক্ষা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদের সাথে সঙ্গতি রেখে যে কোনো নদী তীরবর্তী অঞ্চলের ১৫০ মিটারের মধ্যে তামাক চাষ নিষিদ্ধকরণ আইন অবিলম্বে পাস করাতে হবে এবং এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যদিকে ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে শুধুমাত্র খাগড়াছড়িতে তামাক চাষ ১৩৪ শতাংশ (দ্বিগুণেরও বেশি) বৃদ্ধি পায়। এছাড়া এ সময়ে রাঙ্গামাটিতে তামাক চাষ বৃদ্ধির হার প্রায় ৮৯ শতাংশ, যেখানে আরেক পার্বত্য জেলা বান্দরবনে চাষকৃত জমির পরিমাণ স্থির থাকলেও তা ২০১৭-১৮ সালের চাষকৃত জমির জেলাওয়ারী অবস্থান থেকে ষষ্ঠ হয়েছিল (চিত্র ২)। পাহাড়ী বন উজাড় করে তামাক চাষ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে, তা না হলে এই অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে।

চিত্র ৩: বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় তামাক উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টন)

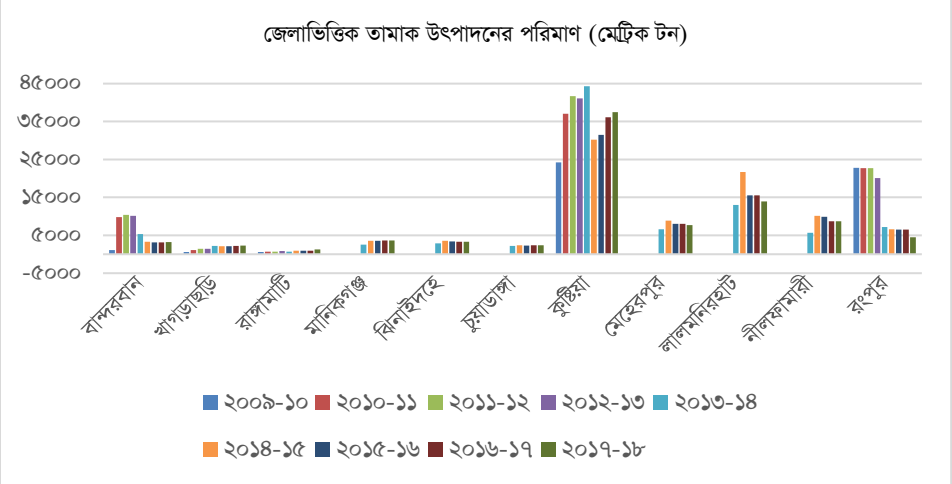

তথ্যসূত্র: *Statistical Year Book* (বিভিন্ন বছর)।

জেলাভিত্তিক তামাক উৎপাদন তথ্যের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র কুষ্টিয়া জেলায় ২০১৭-১৮ কৃষিবছরে মোট উৎপাদিত তামাকের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭,৪৩৭ মেট্রিক টন। ক্রমানুযায়ী লালমনিরহাট, নীলফামারী, মেহেরপুর ও রংপুর জেলায় ২০১৭-১৮ কৃষিবছরে সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপাদিত হয়। তবে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলার তামাক উৎপাদনের ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বগামী রেখা বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ অন্যান্য জেলায় বিভিন্ন বছরের উৎপাদনে উঠানামা বিদ্যমান (চিত্র ৩)।

তামাক চাষ একটি শ্রম-নিবিড়, জটিল চাষাবাদ পদ্ধতি এবং এটি চাষের জন্য বিভিন্ন স্তরে বিপুল পরিমাণ সার, কীটনাশক, ছত্রাকনাশকের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদনের তুলনায়, তামাক চাষের জন্য গড়ে ৮ গুণ বেশি সার ব্যবহার করতে হয়। ফলস্বরূপ জমির উর্বরতা দ্রুত হ্রাস পায় এবং কীটনাশক নিকটস্থ নদীতে পৌঁছে মাছের উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়। অন্যান্য শস্যের তুলনায় তামাক পাতা মাটির উর্বরা শক্তি বিনষ্ট করে ও পুষ্টি-পরিপোষক শক্তি দ্রুত নিঃশেষ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ভুট্টা চাষের তুলনায় তামাক চাষ জমি/মাটি হতে ২.৫ গুণ বেশি নাইট্রোজেন, ৭ গুণ বেশি ফসফরাস এবং ৮ গুণ বেশি পটাশিয়াম গ্রহণ করে (Ali *et al.* 2015)। তাই তামাক চাষে যে শুধুমাত্র খাদ্যশস্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে তা নয়, বরং এটি চাষাবাদের কারণে বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে চরম পরিবেশগত বিপর্যয়ও নেমে আসছে। তামাক কোম্পানিগুলো কেবল কম মজুরি, নারী ও শিশুশ্রম তথা সস্তা শ্রম শোষণের মাধ্যমেই তাদের মুনাফা সর্বোচ্চকরণ করেনা বরং তামাক চাষ, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রক্রিয়ায় পরিবেশ ও প্রতিবেশের যে ক্ষতি সাধন করে সে খরচ বহন না করে তা দরিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর উপর স্থানান্তর করে।

বৈশ্বিক গবেষণা হতে প্রমাণিত যে, অধিকাংশ দেশেই তামাক ব্যবহারকারীরা ২০ বছর বয়সের পূর্বেই তামাক পণ্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে অবগত না হয়েই তামাক পণ্যের ব্যবহার শুরু করে, যা এক সময়ে আসক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যেহেতু তামাক পণ্য ব্যবহার শুরুর বয়স কর্মক্ষম বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত, তাই যখন ব্যক্তি ব্যবহারকারীর আয় বৃদ্ধি পায় তখন সে তামাক পণ্য ভোগের পরিমাণও বৃদ্ধি করে। উল্লেখ্য যে, তামাক পণ্য ব্যবহারের সুযোগ-ব্যয় ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের বেশি। কেননা তামাক পণ্যের উপর খরচ মানে সে অর্থ মৌলিক কোনো চাহিদা পূরণে ব্যবহার করা যেত। খানার উপার্জনকারী সদস্যের তামাকপণ্যের ভোগের দরুন তার তামাক সংক্রান্ত রোগে অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। উপার্জনকারী ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার দরুন সময়-ভিত্তিতে পরিবারের দুই ধরনের আর্থিক ক্ষতি হয়। স্বল্পকালে উপার্জনকারী ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ায় একদিকে কর্মে অনুপস্থিতজনিত উপার্জন ক্ষতি ঘটে এবং অন্যদিকে চিকিৎসা সংক্রান্ত ক্ষতি হয়। দীর্ঘকালে তামাকজনিত রোগে উপার্জনকারী ব্যক্তির অকাল মৃত্যু পরিবারের আয়ে বিশাল ক্ষতির সৃষ্টি করে। এই তত্ত্বের সমর্থনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে উল্লেখিত চীনের উদাহরণটি প্রণিধানযোগ্য। চীনে তামাক পণ্য ব্যবহারের কারণে তামাকসৃষ্ট রোগে খানা প্রধান বা উপার্জনকারী ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে পরিবারের বার্ষিক আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায় এবং তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে ১০ বছর পর্যন্ত সময় লাগে। এভাবেই তামাক সৃষ্ট দারিদ্র্যের দুষ্ট শৃঙ্খলটি কাজ করে থাকে। তামাক সৃষ্ট দারিদ্র্যের দুষ্ট শৃঙ্খল ধারণাটি সর্বপ্রথম U.S. National Cancer Institute and World Health Organization এর গবেষণা প্রকরণ গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়। যদিও তামাক শিল্প দাবি করে থাকে যে, তামাকপণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি দেশের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধির নামান্তর, প্রকৃতপক্ষে তা দেশের

উন্নয়নের অন্তরায়। কেননা ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে তা যেমন দারিদ্র্যের দুষ্ট-শৃঙ্খলকে কার্যকর রাখে, তেমনি সমষ্টিক অর্থনীতিতে তামাকজনিত রোগের চিকিৎসায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়।

একটু গভীরভাবে লক্ষ করলেই স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে দরিদ্রতম জেলাগুলোতেই তামাক চাষ কেন্দ্রীভূত। এ প্রবন্ধে তামাক চাষ ও দারিদ্র্যের কার্যকরণ বিতর্কে না গেলেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তামাক চাষের ফলে সৃষ্ট রোগসমূহে (উল্লেখযোগ্যভাবে Burgers Disease, Chronic Obstructive Pulmonary Disorder (COPD) বাংলাদেশের সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত গোষ্ঠীই আক্রান্ত হচ্ছে। চরম দারিদ্র্যের জন্য এই জনগোষ্ঠী যথাযথ চিকিৎসা সেবাও গ্রহণ করতে পারে না। দিন এনে দিন খাওয়া এ মানুষগুলোর কার্যকর উৎপাদনক্ষম জীবনের এক বড় অংশ রোগে ভোগে ব্যয় হয় অথবা অকালমৃত্যুতে শেষ হয়। ফলস্বরূপ এই পরিবারগুলোর ভবিষ্যৎ তাদের কর্মক্ষম সদস্যের রোগের কারণে কাজ করতে না পারায় বা চিকিৎসার পেছনে অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে বা অকাল মৃত্যুতে চরম ঝুঁকির মুখে পড়ে। দিন যায়, দেশের অগ্রযাত্রার পদধ্বনি অন্য সব জায়গায় স্পন্দিত হলেও দারিদ্র্যপীড়িত তামাক চাষ কেন্দ্রীভূত জেলাগুলোতে তার প্রতিধ্বনি শোনা যায় না। ২০১৭ সালে সর্বশেষ প্রকাশিত Preliminary Report on HIES ২০১৬ প্রতিবেদনেও স্পষ্ট হয় যে, আলোচ্য জেলাগুলোতে দারিদ্র্যের হারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি হয়নি। তামাক সৃষ্ট দারিদ্র্যের দুষ্ট শৃংখল এর অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

চিত্র ৪: বাংলাদেশে তামাক চাষকৃত প্রধান জেলাগুলোতে (সর্বোচ্চ চাষকৃত জমির ক্রমানুসারে ডান হতে বামে) দারিদ্র্যের হার

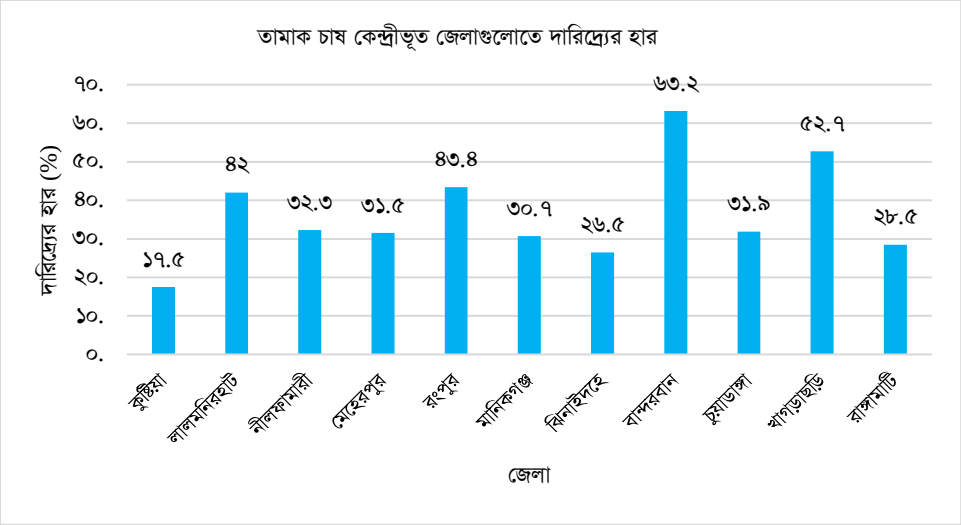

HIES 2016 প্রতিবেদন অনুযায়ী কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও রাঙ্গামাটি বাদে তামাক চাষকৃত প্রধান দশটি জেলার মধ্যে বাকী সাতটিতেই দারিদ্র্যের হার ৩০ শতাংশের বেশি। তবে ঝিনাইদহ (২৬.৫ শতাংশ) ও রাঙ্গামাটিতে (২৮.৫ শতাংশ) দারিদ্র্যের হার ৩০ শতাংশ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এ দশ জেলাতে গড় দারিদ্র্যের হার প্রায় ৪০.০২ শতাংশ (চিত্র ৪) ।

সারণি ৪: তামাক চাষ কেন্দ্রীভূত জেলাগুলোতে দারিদ্র্যের হার ও তার ভিত্তিতে জেলাওয়ারি অবস্থান

সর্বোচ্চ তামাক উৎপাদন ও চাষকৃত এলাকার দিক থেকে প্রধান জেলাগুলোর অবস্থান (২০১৭-১৮ অর্থবছরে)	দারিদ্র্যের হার % (HIES 2016)	২০১৬ প্রতিবেদন অনুযায়ী জেলাওয়ারী (৬৪ জেলার মধ্যে) দারিদ্র্য হারের ভিত্তিতে অবস্থান
কুষ্টিয়া	১৭.৫	৪৬তম
লালমনিরহাট	৪২	১০ম
নীলফামারী	৩২.৩	১৮তম
মেহেরপুর	৩১.৫	২২তম
রংপুর	৪৩.৪	৯ম
মানিকগঞ্জ	৩০.৭	২৫তম
ঝিনাইদহ	২৬.৫	৩৩তম
বান্দরবন	৬৩.২	৩য়
চুয়াডাঙ্গা	৩১.৯	২১তম
খাগড়াছড়ি	৫২.৭	৬ষ্ঠ
রাঙ্গামাটি	২৮.৫	২৯তম

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন বছরের HIES প্রতিবেদন।

সারণি ৪ এর তৃতীয় কলামে আন্তঃজেলা দারিদ্র্যের হারের ভিত্তিতে তামাক চাষকৃত জেলাগুলোর অবস্থান নিরূপণ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে সর্বমোট ৬৫টি জেলার মধ্যে দারিদ্র্যের হারের অধঃক্রম অনুযায়ী আলোচ্য জেলাগুলোর অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এ কলামে কম মান আন্তঃজেলা তুলনামূলক দারিদ্র্য হারের প্রেক্ষিতে খারাপ অবস্থান নির্দেশ করে এবং তার বিপরীতও সত্য। বাংলাদেশের আন্তঃজেলা অবস্থান হতে তামাক চাষকৃত জেলাগুলোর দারিদ্র্যের হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ বাদে বাকি সব জেলার অবস্থান ৩০ এর নিচে, তারপরও সর্বমোট ৬৫টি জেলার মধ্যে কুষ্টিয়া জেলার অবস্থান ৪৬তম।

৬। বাংলাদেশে তামাক দ্রব্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম তামাক উৎপাদনকারী ও ভোগকারী দেশ। GATS জরিপ ২০০৯ ও ২০১৭ এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩৫ লাখ কমে, ৩ কোটি ৭৮ লাখ হয়েছে। কিন্তু এ সময়ে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমে যাওয়ার যে গল্প চারিদিকে প্রচারিত হচ্ছে তা ভ্রান্তিজনক। কেননা বাংলাদেশে ১৫ বছর বা তার অধিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ধূমপান প্রবণতা কমার পেছনে রয়েছে বিড়ি ধূমপায়ীদের সংখ্যার আকস্মিক ও বিরাট হ্রাস। কারণ এ সময়ে মানুষের আয় বেড়েছে, তাই প্রাক্তন বিড়ি ধূমপায়ীরা ও নতুন ভোক্তারা বিড়ি ছেড়ে নিম্ন দামের সিগারেটে ঝুঁকছে। ফলে এ সময়ে বিদ্যমান ও নতুন সিগারেট ধূমপায়ীদের সংখ্যা একত্রিতভাবে বিড়ি ও সিগারেট ত্যাগকারীদের সংখ্যার তুলনায় কম হয়েছে। তাই নিট অর্থে ধূমপায়ীর সংখ্যা কমলেও ২০০৯ হতে ২০১৭ সালের মধ্যে শুধুমাত্র সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এই একই সময়ে বাংলাদেশে মাথাপিছু সিগারেট ভোগের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০০৯ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা ২ কোটি ১৯ লাখ হতে কমে ১ কোটি ৯২ লাখ হয়েছে। অর্থাৎ, এ সময়ে ধূমপায়ীর সংখ্যা প্রায় ২৮ লাখ কমেছে। এছাড়া আলোচ্য সময়ের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য ভোক্তা সংখ্যাও ২ কোটি ৫৯ লাখ হতে কমে ২ কোটি ২০ লাখ হয়। সংখ্যার বিচারে যদিও ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য ব্যবহার হ্রাসের পরিমাণ (৬.৬%- ২৭.২% হতে ২০.৬%) ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্য ব্যবহার হ্রাসের তুলনায় বেশি (৫%- ২৩% হতে ১৮%), তবে এখনো বাংলাদেশ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ধূমপায়ীর সংখ্যা থেকে প্রায় ২৮ লাখ বেশি (সারণি ৫)।

GATS প্রতিবেদনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১৭ সালের মধ্যে বাড়ি ও জনসমাগমস্থল উভয় জায়গাতেই পরোক্ষ ধূমপানের (second hand smoking) সম্মুখীন হওয়ার হার কমেছে। বাড়িতে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হওয়ার হার প্রায় ১৫.৯ শতাংশ কমে ২০১৭ সালে ৩৯ শতাংশে নেমে এসেছে।

সারণি ৫: বাংলাদেশে তামাক ব্যবহার প্রবণতা (লিঙ্গ ও বয়স ভেদে)

	GATS 2009 (১৫+ বছর বয়সি)	GATS 2017 (১৫+ বছর বয়সি)	GYTS 2013 (১৩-১৫ বছর বয়সি)
সার্বিক তামাকের ব্যবহার	৪৩.৩	৩৫.৩	৬.৯
পুরুষদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার	৫৮	৪৬	৯.২
নারীদের মধ্যে তামাকের ব্যবহার	২৮.৭	২৫.২	২.৮
সার্বিক ধূমপান প্রাদুর্ভাব	২৩.০	১৮.০	২.৯
পুরুষদের মধ্যে ধূমপান প্রাদুর্ভাব	৪৪.৭	৩৬.২	৪.০
নারীদের মধ্যে ধূমপান প্রাদুর্ভাব	১.৫	০.৮	১.১
সার্বিক ধোঁয়াহীন তামাক (SLT) ব্যবহার	২৭.২	২০.৬	৪.৫
পুরুষদের মধ্যে ধোঁয়াহীন তামাকের ব্যবহার	২৬.৪	১৬.২	৫.৯
নারীদের মধ্যে ধোঁয়াহীন তামাকের ব্যবহার	২৭.৯	২৪.৮	২.০

তথ্যসূত্র: বিভিন্ন বছরের GATS ও GYTS প্রতিবেদন।

সার্বিক বিচারে পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় বেশি তামাক ব্যবহার করে থাকে। তবে আলোচ্য সময়ে পুরুষদের তামাক ব্যবহার (১২ শতাংশ) অধিকহারে কমলেও নারীদের তামাক ব্যবহার হ্রাসের গতি (মাত্র ৩.৫ শতাংশ) অত্যন্ত মন্থর ছিল (সারণি ৫)। বর্তমানে পুরুষদের তুলনায় নারীদের তামাক পণ্য ব্যবহার অতি নগণ্য। ২০০৯ হতে ২০১৭ সালের মধ্যে পুরুষদের সিগারেট ব্যবহারের হার ২৮.৩ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮.৭ শতাংশ হয়। তবে একই সময়ে পুরুষদের বিড়ি ব্যবহারের হার প্রায় ১১.৭ শতাংশ কমে যায়। অন্যদিকে নারীদের সিগারেট ব্যবহারের হার প্রায় ০.২ শতাংশেই স্থির থাকে এবং বিড়ি ব্যবহারের হার প্রায় ০.৫ শতাংশ কমে ০.৬ শতাংশ এ দাঁড়ায় (চিত্র ৫)। আপাতদৃষ্টে এ তথ্য বিশ্লেষণে মনে হতে পারে যে, বাংলাদেশে নারীদের মধ্যে তামাক ব্যবহার হার অত্যন্ত কম কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক নারী ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য (জর্দা, সাদাপাতা, গুল, খৈনি) ব্যবহারে আসক্ত এবং অধিকাংশই এসবের ভয়াবহ ক্ষতি সম্পর্কে অবগত নয়। বাংলাদেশে ২৩ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারী পানের সাথে খয়ের ব্যবহার করে থাকে এবং ৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নারী গুল ব্যবহার করে থাকে (GATS 2017)। নারীদের ধোঁয়াবিহীন তামাক দ্রব্য ব্যবহারের হার কমাতে না পারলে তা অচিরেই নারীর স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি হয়ে দেখা দিবে, যা প্রকারান্তরে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা

অর্জনে সরকারের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করবে। তাই নারীদের ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আলাদা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এ কর্মপ্রক্রিয়ার অংশস্বরূপ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের উপর ওজনভিত্তিক কর প্রবর্তন নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার।

এছাড়া ধূমপায়ীদের অবস্থানের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, গ্রামীণ এলাকার জনগোষ্ঠী চিরায়তভাবে শহর এলাকার জনগোষ্ঠীর তুলনায় অধিক হারে তামাক পণ্য ব্যবহার করে থাকে। GATS 2017 প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রামের প্রাপ্তবয়স্কদের (১৫+ বছর বয়সি) ৩৭.১ শতাংশ এবং শহুরের প্রাপ্তবয়স্কদের ২৯.৯ শতাংশ তামাক ব্যবহার করে থাকে। তবে ২০০৯ সালের তুলনায় ২০১৭ সালে শহর ও গ্রাম উভয় জায়গাতেই তামাকপণ্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় সমহারে (৮ শতাংশ) হ্রাস পেয়েছে। নিম্ন-আয়ের এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে তামাক ব্যবহারের ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার FCTC-র ২১ নং অনুচ্ছেদ এর প্রতি প্রত্যয় ব্যক্ত করে, বাংলাদেশ সরকার তামাকজনিত রোগ হতে দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক (adults) ও তরুনদের (youth) স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা" ও "রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ কেন্দ্রের" সহায়তায় বাংলাদেশে বৈশ্বিক মান বজায় রেখে শুধুমাত্র ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে ২০১৩ সালে GYTS নামক জরিপ পরিচালিত হয়। এ জরিপ বাংলাদেশের জন্য আরও বেশি অর্থবহ কেননা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার (১৬ কোটি ৪৭ লাখ) প্রায় ১০ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি ৩ লাখ তরুণ-যুবকের বয়স ১৩-১৭ বছরের মধ্যে এবং প্রায় ৪০ শতাংশ অর্থাৎ ৬ কোটি ৬১ লাখ লোক অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনক্ষম (বয়স ৩০-৬৯ বয়সসীমার মধ্যে)। বাংলাদেশে ১৩-১৫ বছর বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে সার্বিকভাবে তামাক পণ্য ব্যবহারের হার প্রায় ৬.৯ শতাংশ, যার সিংহভাগ ভোক্তাই পুরুষ (৯.২ শতাংশ)। তবে এদের মধ্যে তামাক পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা (৫.৯ শতাংশ) সার্বিক ধূমপান প্রবণতার হারের (২.৯ শতাংশ) তুলনায় কম। তরুণদের মধ্যে উভয়ক্ষেত্রেই ছেলেদের তামাক পণ্য ব্যবহারের হার মেয়েদের তুলনায় বেশি (সারণি ৫)।

চিত্র ৫: বাংলাদেশে লিঙ্গভেদে ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্য ব্যবহারের ব্যাপকতার তুলনামূলক চিত্র

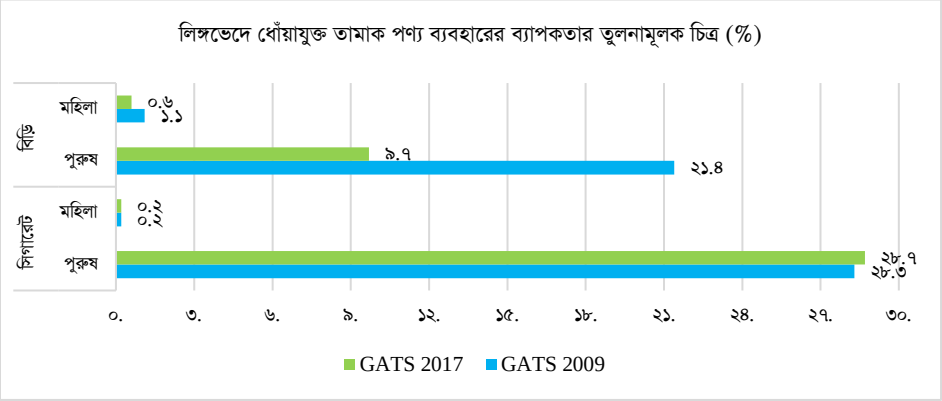

তথ্যসূত্রঃ বিভিন্ন বছরের GATS প্রতিবেদন।

লিঙ্গ ভেদে অবস্থানগত বিশ্লেষণের পর তামাক পণ্য ব্যবহারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের তুলনায় ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে এবং ২০১৭ সালে এসেও এর কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক লোক ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য ব্যবহার করে থাকে। তবে সার্বিক বিচারে আলোচ্য সময়ে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য ব্যবহার হ্রাসের হার (৬.৬ শতাংশ) ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের ব্যবহার হ্রাসের তুলনায় ১.৬ শতাংশ বেশি (সারণি ৫)। যদিও ২০০৯ থেকে ২০১৭ সালের তুলনামূলক বিচারে বাংলাদেশে ধোঁয়াযুক্ত তামাক পণ্যের সার্বিক ব্যবহার কমেছে, কিন্তু এ হার হ্রাস পেয়েছে বিপুল সংখ্যক বিড়ি ধূমপায়ীর সংখ্যা হ্রাসের কারণে। এ ছাড়াও আলোচ্য সময়ে সিগারেট ধূমপায়ীর সংখ্যাতো কমেইনি বরং বেড়েছে। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৩৭ মার্কিন ডলার, যা ২০১৭ সালে ১,৫৪৪ ডলারে উন্নীত হয়, অর্থাৎ আলোচ্য সময়ে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১৪২ শতাংশ বা আড়াই গুণের একটু কম। অর্থনীতির পরিভাষায় যখন আয় বাড়ে, তখন নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। আয় বৃদ্ধির দরুন বাংলাদেশে বিড়ি ধূমপায়ীরা নিকৃষ্ট দ্রব্য হিসেবে বিড়ির চাহিদা কমিয়ে দেয় এবং সিগারেট ধূমপান শুরু করে। শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধিই নয় বরং সিগারেটের প্রকৃত দাম প্রতিবছর কমতে থাকাও এ সময়ে সিগারেট ধূমপায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিভাবে বাংলাদেশে সিগারেটের প্রতিবছর দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও প্রকৃত দাম কমেছে তার উপর এখন আলোকপাত করা হবে।

চিত্র ৬: বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দামের (১০ শলাকা) গতি প্রকৃতি

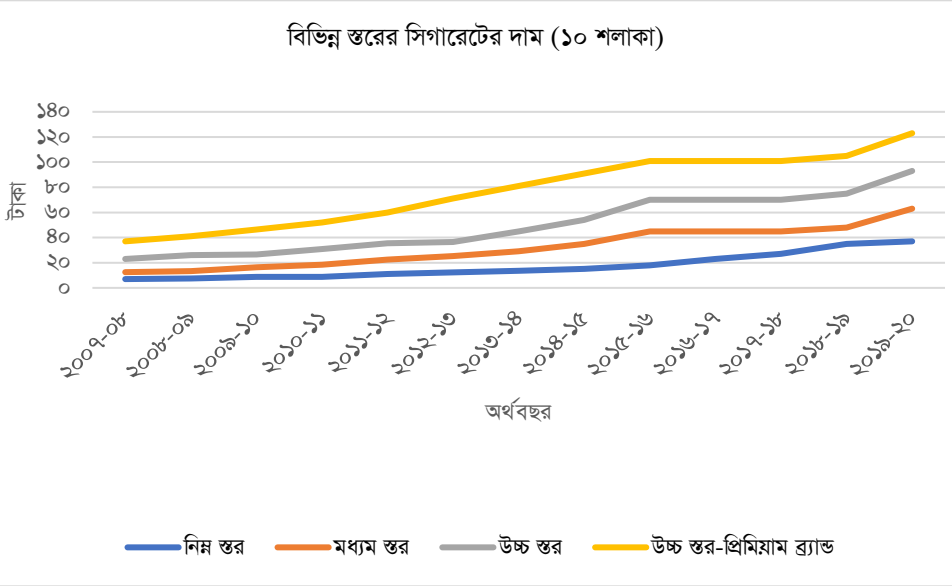

তথ্যসূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

চিত্র ৬ এ ২০০৭-০৮ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত গত ১৩ বছরের বিভিন্ন স্তরের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের দামের গতি প্রকৃতির চিত্রায়ন করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে নিম্ন ও মধ্যম স্তরের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের দাম ছিল যথাক্রমে ৭ টাকা ও ১২.৫ টাকা। অন্যদিকে উচ্চ স্তর ও প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ডের সমপরিমাণ সিগারেটের দাম ২৩ ও ৩৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৭-০৮ হতে ২০১৫-১৬ পর্যন্ত প্রতি স্তরের সিগারেটের দাম রেখাই ঊর্ধ্বগামী ছিল। তবে এ সময়ে উচ্চ স্তর ও প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের দাম নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের দামের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ২০১৫-১৬ সালের পর হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের সিগারেটের দাম বৃদ্ধিতে সুস্পষ্ট স্থবিরতা লক্ষণীয়। বিশেষত এই তিন বছরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের দাম মাত্র ৪ টাকা (১০১ হতে ১০৫ টাকা), উচ্চ স্তরের সিগারেটের দাম মাত্র ৫ টাকা (৭০ হতে ৭৫ টাকা), এবং মধ্যম স্তরের সিগারেটের দাম মাত্র ৩ টাকা (৪৫ হতে ৪৮ টাকা) বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রিমিয়াম, উচ্চ ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের দাম যথাক্রমে মাত্র ৪০ পয়সা, ৫০ পয়সা ও ৩০ পয়সা বৃদ্ধি পায়। উচ্চ আয় প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির হার বিবেচনায়, সিগারেটের এমন নামমাত্র দাম বৃদ্ধি প্রকারান্তরে সিগারেটের ভোগ বৃদ্ধিতে উৎসাহের শামিল। কেননা এমন নিম্ন দাম বৃদ্ধিতে বিড়ি ব্যবহারকারীরা ধূমপান ত্যাগ করে সিগারেট ধূমপান শুরু করবে (সারণি ৬)। তাছাড়া এ ব্যবস্থায় বিদ্যমান সিগারেট ব্যবহারকারীরাও নিম্নস্তরের সিগারেটের কম দামের দরুন উচ্চস্তর, প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ড বা মধ্যম স্তর হতে নিম্ন স্তরের সিগারেটের দিকে ঝুঁকে পড়বে (সারণি ৬)।

গত দুই দশকের শুরুতে (২০০১-০২ সালে) মোট ধূমপায়ীদের মধ্যে ৭২ শতাংশ বিড়ি ও ২৮ শতাংশ সিগারেট ধূমপান করত (Ahmed *et al.* 2018)। উচ্চ আয় প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির দরুন সিগারেটের দাম কম থাকায় বিড়ি ধূমপায়ীরা সিগারেট ধূমপান শুরু করে এবং নব্য ধূমপায়ীরাও বিড়ি ধূমপান না করে সিগারেট ধূমপানের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে ২০১৭-১৮ সালে মোট ধূমপায়ীদের মধ্যে ৭২ শতাংশ সিগারেট ধূমপায়ী পাওয়া যায় (সারণি ৬)। এছাড়াও সারণি ৬ এ দেখা যায় যে, সময়ের সাথে সাথে মোট ধূমপানে বিড়ির অংশ ক্রমহ্রাসমান (২০০৭-০৮ এর ৬০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ তে ৩৪ শতাংশে দাঁড়ায়) এবং সিগারেটের অংশ ক্রমবর্ধমান (২০০৭-০৮ এর ৪০ শতাংশ আরও ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭-১৮ তে ৬৬ শতাংশে দাঁড়ায়)।

সার্বিকভাবে মুদ্রাস্ফীতি ও মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির বিবেচনায় বাংলাদেশে কার্যত সিগারেটের দাম বাড়েনি বরং প্রকৃত দামে বছরের সাথে সাথে নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষণীয়। শুধুমাত্র এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তামাক দ্রব্য উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলো বাংলাদেশকে তাদের সোনার ডিম পাড়া রাজহাঁসরূপে বিবেচনা করে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করেই চলেছে। আলোচ্য সময়ে মাথাপিছু সিগারেট ভোগের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি তাই নির্দেশ করে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক।

সারণি ৬: বাংলাদেশে ধূমপান পণ্যের শ্রেণিভিত্তিক উৎপাদন গতিধারা (বিলিয়ন কাঠি)

অর্থবছর	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ড	২.৯	৩.৩	৪.১	৪.৪	৫.২	৪.২	৩.৮	৪.১	৪	৪.৪	৪.৮
উচ্চ স্তর	৭.৫	৬.৮	৯.২	৭	৮.১	৮.১	৮.৮	৮	৪.৬	৪.৫	৪.৪
মধ্যম স্তর	১১.৭	১৮.৮	১৯.২	১৯.৯	১৯.৪	১৪.৬	১৬.৮	১২.৫	৯.৪	৮.৮	৮.৩
নিম্ন স্তর	১.৪	১৩.৭	৩৩.৬	৪১.৫	৪৯.৪	৩৯.৭	৫০.৩	৫৮.১	৬৫.৯	৬৬.৮	৬৭.৬
মোট সিগারেট উৎপাদন	২৩.৫	৪২.৬	৬৬.১	৭২.৮	৮২.১	৬৬.৬	৭৯.৭	৮২.৭	৮৩.৯	৮৪.৫	৮৫.১
বিড়ি	৩৫.৩	৪৬.৩	৬৩.৪	৬৭.২	৭২.৮	৪৪.৪	৪৬.৮	৪৪.৫	৪৩.২	৪৩.৫	৪৩.৮
মোট ধূমপান পণ্য উৎপাদন	৫৮.৮	৮৮.৯	১২৯.৫	১৪০	১৫৪.৯	১১১	১২৬.৫	১২৭.২	১২৭.১	১২৮	১২৮.৯
মোট ধূমপানে সিগারেটের অংশ(%)	৪০	৪৮	৫১	৫২	৫৩	৬০	৬৩	৬৫	৬৬	৬৬	৬৬
মোট ধূমপানে বিড়ির অংশ (%)	৬০	৫২	৪৯	৪৮	৪৭	৪০	৩৭	৩৫	৩৪	৩৪	৩৪
সিগারেটে নিম্ন দামের সিগারেটের অংশ (%)	৬	৩২	৫১	৫৭	৬০	৬০	৬৩	৭০	৭৯	৭৯	৭৯
সিগারেটে প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ডের সিগারেটের অংশ (%)	১২	৮	৬	৬	৬	৬	৫	৫	৫	৫	৬
সিগারেটে উচ্চস্তরের সিগারেটের অংশ (%)	৩২	১৬	১৪	১০	১০	১২	১১	১০	৫	৫	৫
সিগারেটে মধ্যম স্তরের সিগারেটের অংশ (%)	৫০	৪৪	২৯	২৭	২৪	২২	২১	১৫	১১	১০	১০
নিম্ন দামের সিগারেট ব্যতীত অন্যান্য সিগারেটের মোট অংশ (%)	৯৪	৬৮	৪৯	৪৩	৪০	৪০	৩৭	৩০	২১	২১	২১

তথ্যসূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিশ্ব ব্যাংক প্রতিবেদন, লেখকের পরিগণনা।
*চিহ্ন সাময়িক নির্দেশকারী।

তুলনামূলক বিচারে ২০০৯-২০১৭ সালের মধ্যে বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমলেও সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫ লাখ বৃদ্ধি পেয়েছে (GATS 2017)। কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের বিশেষত সিগারেটের প্রকৃত দাম বৃদ্ধি না হওয়ায় সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা একদিকে যেমন বেড়েছে, তেমনি সিগারেট ব্যবহারকারীদের সিগারেট ভোগের পরিমাণও বেড়েছে এ সময়ে। সিগারেটের ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হলো আপেক্ষিক আয় দাম (Relative Income Price-RIP) পদ্ধতি। এ প্রবন্ধে Blecher & Walbeek (2004) এর আপেক্ষিক আয় দাম পদ্ধতি অনুসরণ করে সিগারেটের ক্রয়ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রতি ১০০ প্যাকেট সিগারেটের দামকে মাথাপিছু আয়ের শতাংশিকরূপে প্রকাশ করা হয়। আপেক্ষিক আয় দামের মান যত কম হয়, মানুষের সিগারেট ক্রয়ক্ষমতা তত বাড়ে। অন্যদিকে বেশি মান কম ক্রয়ক্ষমতা নির্দেশ করে। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশে বিদ্যমান চারটি স্তরের সিগারেটের জন্যই ২০০৭-০৮ হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১২ বছরের জন্য সিগারেটের আপেক্ষিক আয় দাম পরিমাপ করা হয়েছে, যা চিত্র ৭-এ বর্ণিত হয়েছে।

চিত্র ৭: বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন দামস্তর ভেদে সিগারেটের আপেক্ষিক দাম গতিধারা

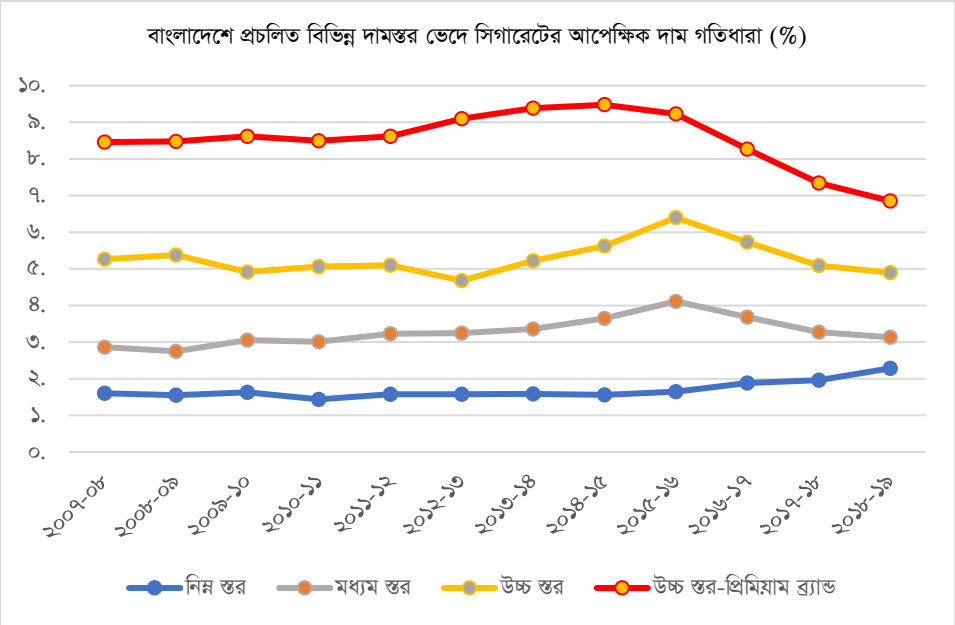

চিত্র ৭ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ২০০৭-০৮ হতে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত উচ্চস্তর ও প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ডের সিগারট ভোক্তাদের সিগারেট ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালে একজন প্রিমিয়াম সিগারেট ভোক্তার ১০০ প্যাকেট সিগারেট ক্রয় করতে মাথাপিছু জিডিপি ৮.৪৬ শতাংশ ব্যয় হত, সেখানে ২০১৮-১৯ সালে একই পরিমাণ সিগারেট ক্রয়ে তার মাথাপিছু জিডিপি মাত্র ৬.৮৫ শতাংশ ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে উচ্চস্তরের সিগারেটের ক্ষেত্রে এ ব্যয় আলোচ্য সময়ে ৫.২৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৪.৯ শতাংশে দাঁড়ায়। অর্থাৎ গত ১২ বছর পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উচ্চস্তর ও প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ডের সিগারেট যথাক্রমে ১.৬১ শতাংশ ও ০.৩৬ শতাংশ পর্যন্ত সহজলভ্য হয়েছে । এ সহজলভ্যতা ভোক্তাদের অবাধ সিগারেট ভোগ করতে উৎসাহিত করে। অন্যদিকে আলোচ্য সময়ে নিম্নস্তর ও মধ্যম স্তরের সিগারেট ভোগ ব্যয় বেড়েছে যথাক্রমে ০.৬৮ শতাংশ (১.৬ শতাংশ হতে ২.২৮ শতাংশ) ও ০.২৭ শতাংশ (২.৮৬ শতাংশ হতে ৩.১৩ শতাংশ), যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য।

অন্যদিকে তুলনীয় বছরটি যদি আরও নিকটে এনে ২০১৫-১৬ ধরা হয়, তবে আরও ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। ২০১৫-১৬ সালে যেখানে মধ্যম স্তরের ১০০ প্যাকেট সিগারেট ক্রয়ে বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের ৪.১১ শতাংশ ব্যয় হত, সেখানে ২০১৮-১৯ সালে মাত্র ৩.১৩ শতাংশ ব্যয় হয়। ২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত মধ্যমস্তর, উচ্চস্তর ও প্রিমিয়াম ব্র্যাণ্ডের ১০০ প্যাকেট সিগারেট ক্রয়ে পূর্বের তুলনায় যথাক্রমে ০.৯৮ শতাংশ, ১.৫ শতাংশ এবং ৩.৬২ শতাংশ কম অর্থ ব্যয় করতে হয়। অন্যদিকে আলোচ্য সময়ে নিম্নস্তরের সিগারেট ক্রয়ে মাত্র ০.৬৩ শতাংশ ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি ভোক্তাদের আর্থিক সঙ্গতির বৃদ্ধির তুলনায় নিতান্তই সামান্য হওয়ায়, সিগারেট ব্যবহার ও ভোক্তা সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্র ৮ এর

নিম্নগামী রেখাগুলি এ বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি। যে পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর নিছক দাম বৃদ্ধি নয় বরং কার্যকর কর আরোপের মাধ্যমে তামাক পণ্যের প্রকৃত দাম বৃদ্ধির রূপরেখা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন না করা হবে, সে পর্যন্ত তামাক পণ্যের অবাধ ব্যবহার স্বল্পমেয়াদে কমিয়ে আনা ও দীর্ঘমেয়াদে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভবপর হবে না।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক খাত হতে আহরিত রাজস্বের (ভ্যাট, শুল্ক বিবিধসহ) পরিমাণ প্রায় ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। তামাক খাতই বাংলাদেশে ভ্যাটের সিংহ ভাগের যোগানদাতা। তামাক খাত হতে প্রাপ্ত রাজস্বের পণ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র সিগারেট হতেই এ খাতের প্রায় ৯৮ শতাংশ আসে। অন্যদিকে বিড়ি হতে মাত্র ১.৫ শতাংশ ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য হতে মাত্র ০.৫ শতাংশ রাজস্ব আহরিত হয়। মনে রাখা দরকার যে, ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য হতে ২০১৭-১৮ সালে রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ১১৪.০৫ কোটি টাকা, যা সংখ্যার বিচারে বাংলাদেশের জিডিপি ও বাজেট উভয়ের তুলনায় অতি নগণ্য।

অন্যদিকে GATS ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ লোক ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্য ব্যবহার করে থাকে, যার সিংহভাগই গ্রামীণ নারী। যদি সরকার জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৩ অর্জনে প্রয়াসী হয়, তাহলে অবিলম্বে সবধরনের ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদন ও বিপণন নিষিদ্ধ করতে হবে। এছাড়াও সরকার প্রতিশ্রুত বিড়িশিল্প বন্ধে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে এবং বিড়ি মালিকদের চাপে নতিস্বীকার না করে তা বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। সকল ধরনের সিগারেটের খুচরা মূল্যের উপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্বাচিত আদর্শিক কর হার ৭৫% আরোপ করতে হবে যাতে একদিকে সিগারেট ভোক্তা সংখ্যা কমে ও অন্যদিকে উচ্চ কর হারের দরুন বিদ্যমান ভোক্তাদের কাছ থেকে অধিক হারে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়। এ ব্যবস্থায় সরকার একদিকে যেমন রাজস্ব প্রবাহ অব্যাহত রাখার কাছাকাছি বৃদ্ধি করতে পারে, অন্যদিকে তেমনি তামাকপণ্য ভোক্তাসংখ্যা হ্রাস করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা পরিস্থিতি উন্নত করতে পারে।

যেকোনো দামের সিগারেটেই নিকোটিন থাকে। ফলে উচ্চস্তরের সিগারেটের দাম বাড়তে থাকলে ব্যবহারকারীরা নিম্নস্তরের সিগারেটের প্রতি ঝুঁকে পড়ে কারণ সিগারেট ব্যবহারকারীরা নিকোটিনে আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই বাংলাদেশে যখন সিগারেটের উপর কর আরোপের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধি করা হয়, তখন ব্যবহারকারীরা উচ্চ স্তরের সিগারেটের পরিবর্তে নিম্নস্তরের সিগারেট ধূমপানে ঝুঁকে পড়ে। ২০০৮-০৯ সালে মোট ভোগকৃত সিগারেটের মধ্যে নিম্নশ্রেণির সিগারেট ভোগের অংশ ছিল মাত্র ৩২ শতাংশ, কর বৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের নামিক দাম (nominal price) বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রিমিয়াম, উচ্চস্তর ও মধ্যমস্তরের সিগারেট ভোক্তারা নিম্নস্তরের সিগারেট ভোগের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে ২০১৭-১৮ সালে মোট সিগারেট ভোগের মধ্যে নিম্নশ্রেণির সিগারেট ভোগের অংশ ৭৯ শতাংশে বৃদ্ধি পায় (সারণি ৬ ও চিত্র ৮) ।

চিত্র ৮: বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণির সিগারেটের উৎপাদনের অংশভিত্তিক গতিপ্রবাহ

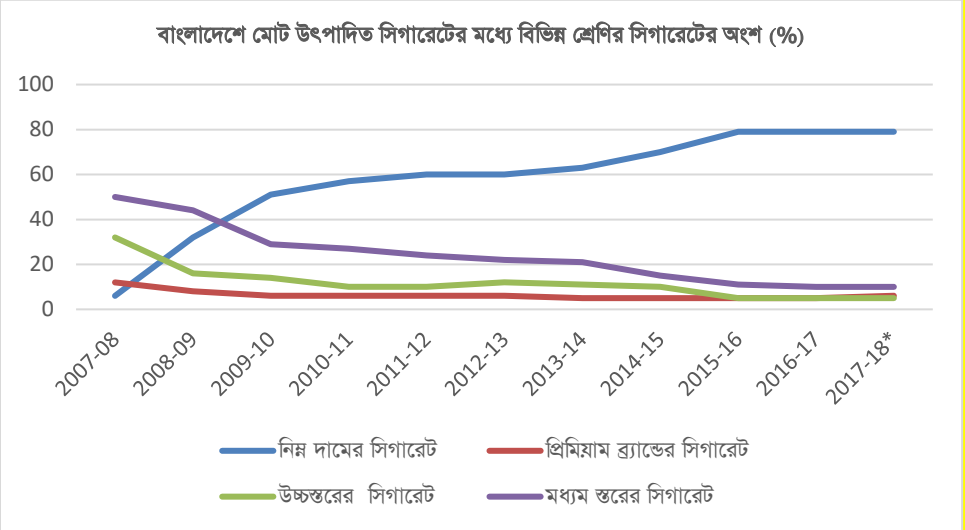

তথ্যসূত্র: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

এ কারণে কর বৃদ্ধি করলেও সিগারেট ব্যবহারকারীরা তা সম্পূর্ণরূপে পরিহার না করে উল্লম্বস্তর (উচ্চস্তর হতে নিম্নস্তর) পরিবর্তন করে। ফলস্বরূপ নিকোটিন গ্রহণ মাত্রা একই রকম থাকে এবং তামাকের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকিও কমে না বরং একই থাকে বা সময়ে তা বেড়েও যায়। তাই কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের দাম বাড়িয়ে, ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমিয়ে তামাকের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়। যদিও এ প্রক্রিয়ায় সরকার কর বৃদ্ধির মাধ্যমে কিছু রাজস্ব লাভ করে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির দোহাই দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে চিন্তা করলে তা কেবলই শুভংকরের ফাঁকি রূপে প্রতীয়মান হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী ২০১৭ সালে শুধুমাত্র তামাক খাত হতে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা। কিন্তু ওই একই বছর তামাকজনিত শুধু ৮টি রোগের চিকিৎসা বাবদ খরচ ছিল ৩০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ তামাকের কারণে সরকারের নিট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৭ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা (Faruque *et al.* 2018)।

৭। বাংলাদেশে তামাকের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কিছু সুপারিশ

> *"বাজারে পণ্যের আসক্তির মাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রতিযোগিতা হয়- সবচেয়ে আসক্তি সৃষ্টিকারী পণ্যটিই এ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। সিগারেট কোম্পানিগুলো গবেষণা ফার্মের সাহায্যে আসক্তি ও বিক্রয় বৃদ্ধি করতে সবচেয়ে কার্যকর উপাদানগুলো খুঁজে বের করে। ..... কোম্পানিগুলো মুনাফা অর্জনের সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ, তাদের সৃষ্ট এ মুনাফা প্রক্রিয়ায় সমাজের যত ক্ষতিই হোক না কেন তাতে" (জোসেফ স্টিগলিজ, ২০০৮)।*

বাংলাদেশে তামাকের অবাধ ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ যে কতটা জরুরি তা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ জর্জ স্টিগলিজের উপরোক্ত উক্তি হতে প্রতিভাত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তামাক পণ্য ব্যবহার

নিয়ন্ত্রণকল্পে সুপারিশমালাসমূহের কলেবর নিঃসন্দেহে বিস্তৃত। এ প্রবন্ধে গবেষণা নিঃসৃত সুপারিশমালার পাশাপাশি কিছু অতি প্রয়োজনীয় সুপারিশমালাও উল্লেখ করা হয়েছে, যার অবতারণা পরোক্ষভাবে এই গবেষণা প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচিত হয়েছে। কেননা সার্বিকভাবে এ সুপারিশমালাসমূহ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত না হলে বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদে তামাক পণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও দীর্ঘমেয়াদে নির্মূল সম্ভবপর হবে না। নিম্নে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে তামাক পণ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রধান সুপারিশসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে এটা প্রমাণিত যে, একটি শ্রেণি/স্তরবিহীন অভিন্ন আবগারি কর ব্যবস্থা ভোক্তাদের দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে উচ্চদাম থেকে নিম্ন দামের সিগারেটের প্রতি ঝোঁকার প্রবণতা বন্ধ করতে সক্ষম এবং এটি একটি প্রমাণিত ধূমপান ত্যাগ সহায়ক কর ব্যবস্থা। তাই বাংলাদেশ সরকারের অবিলম্বে একটি শ্রেণিবিহীন/স্তরবিহীন অভিন্ন আবগারি কর ব্যবস্থা (সিগারেট ও বিড়ির উপর) প্রবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি।

২. বাংলাদেশে মূল্যানুপাতিক কর ব্যবস্থা তামাক দ্রব্যের দাম বাড়াতে, ধূমপায়ীদের সংখ্যা কমাতে ও রাজস্ব বাড়াতে কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়নি। তাই এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ও অভিন্ন কর ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনে সক্ষম হবে। তাছাড়া চলতি বাজেটে সিগারেটের বিভিন্ন স্ল্যাব কমানো এবং তামাক দ্রব্যের উপর সুনির্দিষ্ট কর আরোপের বিষয়টি অনুল্লেখিতই থেকে গেছে।

৩. তামাক চাষ নিরুৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে তামাক চাষীদের রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সিং বাধ্যতামূলক করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে তামাক চাষীরা সংশ্লিষ্ট কৃষি বিভাগকে তামাক চাষকৃত জমির পরিমাণ ও সম্ভাব্য উৎপাদন মাত্রা সম্পর্কে অবহিত করবে। এছাড়া তামাক চাষীদের জন্য পৃথক লাইসেন্স প্রবর্তন করতে হবে যা অর্জন ও নবায়ন ফি বাবদ সরকার একটি অতি উচ্চ নির্দিষ্ট খরচ (Fixed Cost) ধার্য করে দিবে যা হতে প্রাপ্ত রাজস্ব সরকার বর্তমান তামাক চাষীদের মধ্যে তামাক চাষ পরিত্যাগে ইচ্ছুক চাষীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও তামাক চাষীদের লাইসেন্সিং এর আওতায় আনা জরুরি যাতে তামাক চাষীরা সরকার কর্তৃক ভর্তুকিকৃত সার না পায়। তামাক চাষে সরকার কর্তৃক ভর্তুকিকৃত সার ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি বন উজাড় করে তামাক চাষ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং এ অঞ্চলের নদী তীরবর্তী (বিশেষত মাতামুহুরী নদী) ১৫০ মিটারের মধ্যে তামাক চাষ নিষিদ্ধকরণ আইন পাশ ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে (FCTC-র ১৮ নং অনুচ্ছেদ পরিপালন)। তা না হলে এ অঞ্চলের বাস্তুচক্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হবে এবং ফলস্বরূপ জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে।

৫. তরুণদের (১৩-১৭ বছর বয়সি) মধ্যে তামাক ব্যবহার নিরুৎসাহিতকরণে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বাস্তবায়নযোগ্য যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, কেননা বাংলাদেশে তামাক ব্যবহারকারীদের প্রথম তামাকপণ্য ব্যবহার শুরু করার গড় বয়স ১৭ বছর। কর্মপরিকল্পনার

অংশ হিসেবে পাঠ্যক্রমে তামাকজনিত রোগের ভয়াবহতা উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে তরুণরা তামাক পণ্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

৬. একদিকে বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় অঙ্গীকারবদ্ধ, অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর (BAT) ১০ শতাংশ (সরাসরি সরকার ০.৬৪ শতাংশ, ICB ৫.৭৫ শতাংশ, স্থানীয় বিনিয়োগকারী ৪.০৭ শতাংশ) শেয়ারের মালিক। শুধু তাই নয় BAT এর কার্যনির্বাহী পরিষদের ৬০ শতাংশের বেশি সরকারি কর্মকর্তা। এই সমস্ত উদাহরণ পরস্পর স্বার্থবিরোধী। তাই নৈতিকভাবে বাংলাদেশ সরকারের BAT এর শেয়ার পরিত্যাগ করা উচিত যাতে তামাক নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে সরকার যে অঙ্গীকারবদ্ধ ও আন্তরিকভাবে সচেষ্ট তা প্রতিফলিত হয়।

৭. PROACTT (2018) এর তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করে যদি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলো ধূমপায়ীদের ঋণ দিবে না এমন ঋণ শর্ত আরোপ করে তবে তারা ধূমপান ছেড়ে দিবে। তাই সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে যোগ্যতা হিসেবে প্রার্থীকে অ-ধূমপায়ী হওয়ার শর্ত আরোপ করতে হবে।

৮. PROACTT (2018) এর গবেষণায় আরও উঠে আসে যে অংশগ্রহণকারী খানার ৩৮ শতাংশ ক্ষুদ্র ঋণ নিয়েছিল, এদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছে যে ক্ষুদ্র ঋণ নেয়ার সময় ধূমপান করে কিনা তা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং মাত্র ৩ শতাংশ উত্তরদাতার শুধুমাত্র ধূমপায়ী হওয়ার কারণে ঋণ পেতে অসুবিধা হয়েছিল। এই চিত্র প্রকাশ করে যে ক্ষুদ্রঋণ পাওয়ার যোগ্যতা হিসাবে ঋণগ্রহীতার অ-ধূমপায়ী হওয়ার শর্ত আরোপ করার সুযোগ রয়েছে এবং তা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অবাধ তামাক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কার্যকরি উপায় হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে। তাই ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোকেও তামাক বিরোধী আন্দোলনে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

৮। উপসংহার

Institute for Health Metrics and Evaluation এর ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ২০১৭ সালে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু এবং অক্ষমতা (Disability) ঘটায় এমন ঝুঁকির কারণ (Risk Factor) স্বরূপ তামাকের অবস্থান ৫ম। যদিও এ প্রবন্ধে তামাকের কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাক পণ্যের দাম বৃদ্ধিকে তামাক পণ্য ব্যবহার বন্ধের প্রধানতম কার্যকর উপায় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তবে বাস্তবিক অর্থে শুধুমাত্র তামাকের কর বৃদ্ধিই দীর্ঘমেয়াদে তামাক পণ্য ব্যবহার বন্ধের জন্য যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, কঠোর ও কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ও এ সংক্রান্ত আইন এবং তার বাস্তব প্রয়োগ। তবেই বাংলাদেশে তামাক পণ্যের অবাধ ব্যবহারে লাগাম টেনে ধরাসহ জনস্বাস্থ্যের ওপর তামাকসৃষ্ট রোগের বোঁঝা কমানো সম্ভব হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ahmed, Sadiq, Zaidi Sattar and Khurshid Alam (2018): *Bangladesh: Illicit Tobacco Trade*. Draft report prepared for the World Bank, Policy Research Institute of Bangladesh, Dhaka.http://pubdocs.worldbank.org/en/455291548434730684/WBG-Tobacco-IllicitTrade-Bangladesh.pdf

Ali, Md. Yeamin, Md. Fakrul Islam, Md. Redwanur Rahman, Mahfuza Khanom Sheema and Mst. Rupali Akhtar (2015): "Tobacco Farming in Bangladesh and Its Impact on Environment," *IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology* (IOSR-JESTFT), Volume 9, Issue 12.

Ali, Z., Atiur Rahman and T. Rahman (2003, July 1): Appetite for Nicotine: An Economic Analysis of Tobacco Control in Bangladesh. Retrieved from http://documents.worldbank.org/curated/en/207721467996775495/Appetite-for-nicotine-An-economic-analysis-of-tobacco-control-in-Bangladesh.

BBS (2012, 2015, 2018): *Yearbook of Agricultural Statistics* 2012, 2015,2018. 25th Series. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, April 2015

Blecher, E. H. and CP van Walbeek (2004): "An International Analysis of Cigarette Affordability," *Tobacco Control*, 13:339-346

Drope, J., N. Schluger, Z. Cahn, J. Drope, S. Hamill, F. Islami, A. Liber, N. Nargis and M. Stoklosa. (2018): *The Tobacco Atlas*. Atlanta: American Cancer Society and Vital Strategies.

IARC (2011): "Effectiveness of Tax and Price Policies for Tobacco Control," In: Daniel J. (editor), *Handbooks of Cancer Prevention*. Lyon: International Agency for Research on Cancer.

Faruque, G. M., S. N. Wadood, M. Ahmed, R. Parven and I. Huq et al. (2019): *The Economic Cost of Tobacco Use in Bangladesh: A Health Cost Approach.* Bangladesh Cancer Society.

Mathers, C.D. and D. Loncar (2006): "Projections of Global Mortality and Burden of Disease from 2002 to 2030," *PLoS Medicine*, 3(11):e442.

Nargis, N., A. G. Hussain, M. Goodchild, A. C. Quah and G. T. Fong (2019): "A Decade of Cigarette Taxation in Bangladesh: Lessons Learnt for Tobacco Control," *Bulletin of the World Health Organization*, 97(3), 221–229. doi:10.2471/BLT.18.216135

Nargis, N., U. H. Ruthbah, A. K. M Ghulam Hussain, G. T. Fong, I. Huq and S. M. Ashiquzzaman (2014): "The Price Sensitivity of Cigarette Consumption in

Bangladesh: Evidence from the International Tobacco Control (ITC) Bangladesh Wave 1 (2009) and Wave 2 (2010) Surveys," *Tobacco Control*, 23:i39-i47.

Nargis N., M. Stoklosa, J. Drope, G. T. Fong, ACK Quah, P. Driezen et al. (2018): "Trend in the Affordability of Tobacco Products in Bangladesh: Findings from the ITC Bangladesh Surveys," *Tobacco Control*, April 19.

Stiglitz, J. E. (2008): "Toward a General Theory of Consumerism: Reflections on Keynes's Economic Possibilities for Our Grandchildren," Pecchi L. and Piga G (Red) *Revisiting Keynes Econ Possibilities Our Gd*. 2008;41–86. DOI:10.7551/mitpress/9780262162494.003.0004

U.S. National Cancer Institute and World Health Organization (2016): *The Economics of Tobacco and Tobacco Control.* National Cancer Institute Tobacco Control Monograph 21. NIH Publication No. 16-CA-8029A. Bethesda, MD: U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute; and Geneva, CH: World Health Organization.

World Health Organization (2017): *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2017: Monitoring Tobacco Use and Prevention Policies*. World Health Organization.

World Health Organization (2009): *Global Adult Tobacco Survey: Bangladesh Report 2009.*

World Health Organization (2013): *WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2013: Enforcing Bans on Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship.*

http://apps.who.int/fctc/implementation/database/sites/implementation/files/documents/reports/bangladesh_2014_report.pdf//Accessed on 11November, 2019

http://apps.who.int/fctc/implementation/database/sites/implementation/files/documents/reports/bangladesh_2012_report.pdf//Accessed on 11November, 2019

http://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DOA53DJK //Accessed on 11 November, 2019.

http://www.batbangladesh.com/group/sites/BAT_9T5FQ2.nsf/vwPagesWebLive/DOA53LZ4?opendocument // Accessed on 11 November, 2019.

http://www.fao.org/faostat/en/#country/16 //Accessed on 11November,2019

https://www.tobaccofreekids.org/assets/global/pdfs/en/Bangladesh_tob_burden_en.pdf //Accessed on 11November,2019

https://www.tobaccofreekids.org/problem/toll-global/asia/bangladesh//Accessed on 11 November, 2019

https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/factsheet/policy_status/bangladesh//Accessed on 11 November, 2019

https://www.who.int/tobacco/global_report/en/ //Accessed on 11 November, 2019